নির্দিষ্ট ভূখণ্ড বা জনপদ প্রতিষ্ঠার প্রমাণ নেই তখন সে যুগে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল তা বলা যায় না। তাছাড়া, সরকার বলতে যে বিশেষ এক সুবিন্যস্ত, সর্বব্যাপী, স্থায়ী প্রশাসনিক কাঠামো বোঝায় তাও যেন ঋগ্‌বেদের যুগে পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করেনি। ফলে আর্যজনগোষ্ঠীগুলি সে সময় উপজাতি স্তরেই থেকে গিয়েছিল, তারা রাষ্ট্রশক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি। ভারতের মাটিতে আর্য রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটল আরও পরে, পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষ পর্বে।

আর্য জনগোষ্ঠীর মূল ভিত্তি ছিল পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার বা 'কুল'। পরিবার প্রধানকে 'কুলপা' বলা হত। এক একটি পরিবারে অনেকগুলি শাখা-প্রশাখা ছিল। কয়েকটি পরিবার নিয়ে ছিল এক একটি গ্রাম। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে আবার এক একটি বিশ। কয়েকটি বিশ নিয়ে একটি জন বা গোষ্ঠী। অনেকের ধারণা 'বিশ' ও 'জন' পদ দু'টি একই অর্থে ঋগ্‌বেদে ব্যবহৃত হয়েছে।

বিভিন্ন ঋগ্‌বৈদিক উপজাতির মধ্যে ক্ষমতায় ও প্রতিষ্ঠায় ভরতরা ছিলেন সকলের উপরে। সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও যমুনা নদীর অববাহিকায় তাঁরা বাস করতেন। এই অঞ্চলই পরবর্তিকালে ব্রহ্মাবর্ত নামে পরিচিত হয়। ভরতদের নাম থেকেই আমাদের দেশের নাম ভারত বা ভারতবর্ষ হয়েছে। ঋগ্‌বেদে ভরতদের কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এমনি এক রাজা দিবোদাস। তিনি পুরু, যদু ও তুর্বশ নামে তিনটি আর্য উপজাতিকে পরাজিত করেন। তাছাড়া দাসরাজ শম্বর ও অনার্য পণিরাও তাঁর হাতে পরাজিত হন। দিবোদাসের পুত্র পিজবন, পিজবনের পুত্র সুদাস। সুদাস শুধু এক বড় যোদ্ধাই ছিলেন না, গুণী বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল। ঋগ্‌বেদের অনেক মন্ত্র তাঁরই রচনা। সরস্বতী নদীর অববাহিকায় আর এক উপজাতির বাস ছিল। তাঁরা পুরু, ভরত উপজাতির ঘোর শত্রু। ঋগ্‌বেদে তাঁদের চারজন রাজার কথা বলা হয়েছে। তাঁরা হলেন দুর্গহ, দুর্গহের পুত্র গিরিক্ষিৎ, গিরিক্ষিতের পুত্র পুরুকুৎস ও পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু। পুরুকুৎস ভরতরাজ সুদাসেরই সমসাময়িক ছিলেন। পুরুকুৎস দাসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

তৃৎসু উপজাতি পরুষ্ণী বা ইরাবতী নদীর পূর্বতীরে বাস করতেন। ঋগ্‌বৈদিক যুগেই তৃৎসুরা সম্ভবত ভরতদের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যান। ক্রিবিরা সিন্ধু ও অসিক্‌নী বা চন্দ্রভাগার তীরবর্তী অঞ্চলে বাস করতেন। সৃঞ্জয় উপজাতির অবস্থান সম্পর্কে কোনও সঠিক ধারণা করা যায় না। কেউ কেউ বলেন তাঁরা যমুনার পূর্বে পঞ্চাল অঞ্চলে বাস করতেন। আবার অনেকের মতে তাঁদের বাস ছিল সিন্ধুর পশ্চিমে বা উচ্চ সিন্ধু অববাহিকায়। সৃঞ্জয় উপজাতির এক দলপতি দৈববাত। তুর্বশ ও বৃচীবন্ত নামে দু'টি আর্য গোষ্ঠীকে তিনি পরাভূত করেন।

দক্ষিণ পাঞ্জাব বা হরিয়ানায় তুর্বশদের অবস্থান ছিল। সেখানে যদু নামে আর এক উপজাতিরও বাস ছিল। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছিল বৃচীবন্তদের বাসস্থল। চন্দ্রভাগা ও ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে দ্রুহ্যু ও অনু উপজাতির বাস ছিল। অনু, দ্রুহ্যু, যদু ও তুর্বশরা পুরুদের মিত্র ছিলেন। অনেকের ধারণা, এঁদেরই ঋগ্‌বেদে 'পঞ্চজনা' বলা হয়েছে। এ মত যে সকলেই মানেন, তা নয়। মৎস্য উপজাতির লোকেরা আলোয়ার, ভরতপুর ও জয়পুর অঞ্চলে বাস করতেন। পক্‌থ উপজাতির অবস্থান ছিল সম্ভবত পূর্ব আফগানিস্তানে। আধুনিক পকথুনরা বোধহয় তাঁদেরই বংশধর। ভলানসদের বাস ছিল কাবুলিস্তান অঞ্চলে। অলিনরা উত্তর-পূর্ব কাফিরিস্তানে বসবাস করতেন। ক্রুমু ও গোমতী নদীর উপত্যকায় বিষাণীদের বসতি ছিল। সিন্ধু ও বিতস্তা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে শিবদের বাস ছিল। যমুনা নদী ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল চেদিদের বাস। ঋগ্‌বেদে কশু নামে এক পরাক্রান্ত চেদি রাজার কথা বলা হয়েছে। শোনা যায়, তিনি

দশজন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁদের ক্রীতদাস করে নিজের পুরোহিতকে উপহার দেন।

উশীনররা সম্ভবত ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে বাস করতেন। তাঁরা মধ্যদেশ বা বিনশন-এলাহাবাদ সংলগ্ন অঞ্চলে বাস করতেন, এ মতও অনেকে পোষণ করেন। গন্ধারিরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বাস করতেন। পারাবতরা বাস করতেন যমুনা নদীর তীরে। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে বেলুচিস্তানের উত্তরাঞ্চলে তাঁদের বাস ছিল। কিন্তু এ মত সকলে স্বীকার করেন না।

ঋগ্বেদের যুগে আর্য-উপজাতিগুলির মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল। যুদ্ধবিগ্রহ সাধারণত লাগত গবাদি পশু ও পশুচারণ ভূমির অধিকার নিয়ে। অনেক সময় গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের পারস্পরিক বিদ্বেষ থেকেও যুদ্ধের সূত্রপাত হত। ঋগ্বৈদিক যুগের বৃহত্তম রাজনৈতিক ঘটনা দশ রাজার যুদ্ধের কারণও সেই পারস্পরিক বিদ্বেষ।

ভরত উপজাতির রাজা ছিলেন সুদাস। বিশ্বামিত্র ছিলেন রাজপুরোহিত। বিশ্বামিত্রের কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে সুদাস তাঁকে পদচ্যুত করেন ও বশিষ্ঠকে পুরোহিত নিযুক্ত করেন। এতে বিশ্বামিত্র অপমানিত বোধ করেন। প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে তিনি দশ উপজাতির এক মিত্রজোট গঠন করে সদলে সুদাসকে আক্রমণ করেন। পুরু, যদু, তুর্বশ, অনু, দ্রুহ্যু, অলিন, পক্থ, ভলানস, শিব ও বিষাণীরা বিশ্বামিত্রের মিত্রজোটে যোগ দেন। পরুষ্ণী নদীর তীরে বিবদমান পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে ভরতরাজই জয়লাভ করেন। শত্রুপক্ষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়, পুরুদের রাজা পুরুকুৎস যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান। অনু ও দ্রুহ্যুদের রাজারা পরুষ্ণী নদীর জলে ডুবে মারা যান। পরাজয় সত্ত্বেও মিত্রজোটের সদস্যরা তাঁদের স্বাধীনতা হারাননি, পূর্বের মতোই তাঁরা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে থাকেন।

দশ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়াও সুদাস আর একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এবার বিপদ আসে তিন অনার্য উপজাতির কাছ থেকে। রাজা ভেদের নেতৃত্বে অজ, শিগ্রু ও যক্ষ নামে তিনটি অনার্য গোষ্ঠী সংঘবদ্ধভাবে সুদাসকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধ ঘটে যমুনা নদীর তীরে। ভাগ্যলক্ষ্মী এবারও সুদাসের প্রতি প্রসন্ন হন।

দেখা যাচ্ছে, ঋগ্বেদের যুগে বিভিন্ন আর্যগোষ্ঠী বা উপজাতিগুলির মধ্যে বাদবিসংবাদ লেগেই ছিল। আবার তাঁদের অনার্যদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হত। ঋগ্বেদে ইলিবিশ, ধুচি, চুমুরি, শম্বর, বর্চী, পিপ্রু ইত্যাদি নামে কয়েকজন অনার্য রাজার উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে কিরাত, কীকট, চণ্ডাল, পর্ণাক, সিন্ধু প্রভৃতি কয়েকটি অনার্য উপজাতিরও নাম আছে। তাঁরা প্রধানত গাঙ্গেয় ভূ-ভাগেই বসবাস করতেন। আর্যরা পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করলে এই অনার্য গোষ্ঠীরাই তাঁদের বাধা দেন। কিন্তু আর্যদের প্রতিহত করার শক্তি এই অনার্যদের ছিল না।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা : এক এক জনগোষ্ঠীর পরিচালক যিনি ঋগ্বেদে তাঁকে প্রায়ই রাজা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কখনও তাঁকে 'বিশপতি', 'গণপতি' বা 'জ্যেষ্ঠ'ও বলা হয়েছে। গোষ্ঠীপতিকে কখনও কখনও 'সম্রাট্', 'একরাট্', 'অধিরাট্' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। একজনকে তো 'বিশ্বস্য ভুবনস্য রাজা' অর্থাৎ 'বিশ্বভুবনের কর্তা' এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ থেকে অনেকে মনে করেন, ঋগ্বেদের যুগে বিশ্বজনীন রাজত্বের আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু যে যুগে রাষ্ট্র বা রাজ্যই ছিল না সে যুগে সর্বজনীন রাজত্বের আদর্শ প্রচারিত হয় কী করে? আর ঋগ্বেদের এই ধরনের উক্তিকে পরবর্তী সংযোজন বলে বাতিল করাও যায় না, কারণ এগুলি সংহিতার

প্রায় সকল মণ্ডলেই ছড়ানো রয়েছে। আসলে গোষ্ঠীপতিদের কেউ কেউ নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের গুণে আপন গোষ্ঠীতে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। এই ধরনের গোষ্ঠীপতিরা সংখ্যায় নগণ্যই ছিলেন। ঋগ্‌বেদের এরূপ বিভিন্ন উল্লেখে নিজ নিজ গোষ্ঠীতে দলপতির এই অসীম ক্ষমতাই যেন আভাসিত হয়েছে।

সচরাচর যা হয়ে থাকে, গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই একজন দলপতি মনোনীত হতেন। আবার একই পরিবারের লোক পুরুষানুক্রমে দলপতিত্ব করে গেছেন এমন ঘটনাও ঋগ্‌বেদে বিরল নয়। ভরতগোষ্ঠীতে সুদাসেরা অন্তত চার পুরুষ ধরে তাই করেছেন। সুদাসের পূর্বে তাঁর প্রপিতামহ বধ্র্যশ্ব, পিতামহ দিবোদাস, পিতা পিজবন পর পর গোষ্ঠী প্রধানের পদ অলংকৃত করেছেন। তেমনি দুর্গহ, তাঁর পুত্র গিরিক্ষিৎ, পৌত্র পুরুকুৎস ও প্রপৌত্র ত্রসদস্যু ক্রমান্বয়ে পুরুগোষ্ঠীকে পরিচালনা করেছেন।

অনার্য ও প্রতিদ্বন্দ্বী আর্য উপজাতির আক্রমণ থেকে নিজের গোষ্ঠীর লোকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা করা ছিল দলপতির প্রধান কাজ। কিন্তু উপজাতির লোকেরা একে অন্যের প্রতি কোনও অপরাধ করলে বা উচ্ছৃঙ্খল হলে দলপতির ভূমিকা কী হবে ঋগ্‌বেদে তার কোনও আভাস নেই। তবে মনে হয়, উপজাতির লোকেরা যাতে শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখেন সে দিকে দলপতির সতর্ক দৃষ্টি ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার ও প্রয়োজনে তাকে শাস্তি দানের অধিকারও বিশপতির ছিল।

ঋগ্‌বেদে স্পশ বা গুপ্তচরের উল্লেখ আছে। মনে হয় অনার্য, প্রতিবেশী আর্য-উপজাতি ও নিজের গোষ্ঠীর লোকদের গতিবিধির উপর নজর রাখার জন্যই দলপতি গুপ্তচর নিয়োগ করতেন।

পুরু উপজাতির রাজা ত্রসদস্যুকে ঋগ্‌বেদে 'অর্ধদেবতা' বলা হয়েছে। অন্য কোনও রাজা বা গোষ্ঠীপতির ক্ষেত্রে এরূপ বর্ণনা নেই। রাজা বা গোষ্ঠীপতি সমাজের অন্য সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, এরূপ একটি ধারণাই যেন এ যুগের একেবারে শেষের দিকে মূর্ত হয়ে ওঠে।

ঋগ্‌বেদের যুগে রাজার বা দলপতির আয়ের উৎস কী ছিল? তখনকার দিনের লোকেরা রাজাকে কোনও নিয়মিত কর দিতেন না, যা দিতেন তা 'বলি'। 'বলি' বলতে প্রণামী, দান বা উপহার বোঝায়। প্রথম প্রথম লোকেরা বিশেষ কোনও উৎসবে বা অনুষ্ঠানে রাজাকে 'বলি' পাঠাতেন। 'বলি' তাঁরা দিতেন স্বেচ্ছায়, কোনও বাধ্যবাধকতার বশে নয়। কিন্তু পরে এই দান নিয়মিত এবং সম্ভবত আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। শত্রু পরাজিত হলে তার লুণ্ঠিত সম্পত্তির ভাগ রাজা পেতেন। নদীস্তুতিগুলিতে রাজার অনেক দানের উল্লেখ আছে, কিন্তু ভূমিদানের কোন কথা নেই। মনে হয়, সে যুগে রাজা জমির মালিক ছিলেন না, চারণভূমি ছাড়া বাকি জমি পরিবার বা পরিবারকর্তার নিয়ন্ত্রণে ছিল।

ঋগ্‌বেদের রাজার বা দলপতির সঙ্গে প্রাচীন মেসোপটেমিয়া, সুমের বা ব্যাবিলোনিয়ার রাজার এক মৌল পার্থক্য আছে। ওসব দেশে রাজা শুধু সর্বোচ্চ প্রশাসকই ছিলেন না, রাজ্যের প্রধান পুরোহিতও ছিলেন। কিন্তু ঋগ্‌বেদের রাজার কাজ ছিল মূলত সামরিক ও কিছুটা প্রশাসনিক। যাগ-যজ্ঞ তথা ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে রাজার ভূমিকা ছিল পৃষ্ঠপোষকের। পুরোহিতেরই সেখানে অগ্রণী ভূমিকা। গোষ্ঠীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নতিতে যাগ-যজ্ঞের আবশ্যকতা সম্পর্কে রাজা বা গোষ্ঠীর সাধারণ লোকদের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। ফলে রাজা ও পুরোহিতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও নির্ভরতা গড়ে উঠেছিল। এমনকী যুদ্ধক্ষেত্রেও

রাজা পুরোহিতের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। তাছাড়া নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজা পুরোহিতের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কখনও কখনও অবশ্য রাজা ও পুরোহিতের মধ্যে বিরোধও দেখা দিত। দশ রাজার যুদ্ধ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু এসব ঘটনা কদাচিৎ ঘটত। পুরোহিত বলতে প্রধান পুরোহিতকেই বোঝায়। প্রধান পুরোহিতকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন অধস্তন পুরোহিতও ছিলেন।

পুরোহিত ছাড়া আরও অনেকে রাজাকে গোষ্ঠী পরিচালনায় সাহায্য করতেন। এঁদের একজন হলেন সেনানী। তাঁর কাজ ছিল যুদ্ধের সময় রাজাকে সাহায্য করা। ছোটখাটো যুদ্ধে রাজা নিজে অংশগ্রহণ করতেন না, সেনানীর উপর সে কাজের দায়িত্ব পড়ত। শান্তির সময় সেনানী প্রশাসনিক কাজে রাজাকে সাহায্য করতেন।

গ্রামের সামরিক ও বেসামরিক কাজের দায়িত্বে ছিলেন গ্রামণী। তাঁর আর এক নাম ব্রাজপতি। এক একটি উপজাতির লোকেরা অনেকগুলি গ্রাম জুড়ে বাস করতেন। ফলে এক একটি উপজাতিতে গ্রামণীর সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। অন্যান্য উপজাতির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য দূত নামে এক শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত হতেন।

আইন বা রীতি অর্থে ঋগ্‌বেদে ধর্ম কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সময় চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, গোধন-অপহরণের মতো অপরাধমূলক ঘটনা প্রায়ই লেগে থাকত। খুন-খারাপিও যে হত না, তা নয়। কিন্তু রক্তের বদলে রক্ত বা প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ তৎকালীন বিচার-ব্যবস্থায় ছিল না। খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হলে অপরাধীকে ১০০টি গোরু জরিমানা দিতে হত। দু'পক্ষে বিরোধ দেখা দিলে যিনি মধ্যস্থ হতেন তাঁকে 'মধ্যমশী' বলা হত। অধমর্ণ ঋণশোধে অপারগ হলে তাঁকে কিছুকাল উত্তমর্ণের দাসত্ব স্বীকার করতে হত।

ঋগ্‌বেদে সভা ও সমিতি নামে দু'টি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ আছে। কিন্তু এদের মধ্যে সমিতি সম্পর্কেই যা কিছু জানা যায়, সভা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন উল্লেখ থেকে মনে হয়, সমিতি ছিল উপজাতির সর্বসাধারণের পরিষৎ। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে উপজাতির সকল বয়স্ক লোকই এই পরিষদের সদস্য হতেন। রাজা সমিতির অধিবেশনে পৌরোহিত্য করতেন। তিনি সমিতিতে সদস্যদের নানাভাবে প্রভাবিত করতে চাইতেন, কিন্তু সমিতিতে একবার কোনও সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তা অমান্য করার অধিকার তাঁর ছিল না। ঋগ্‌বেদের সর্বশেষ স্তোত্রে সমিতির সদস্যদের বলা হয়েছে, তাঁরা যেন একসঙ্গে চলেন (সংগচ্ছদ্ধম্), এক সুরে কথা বলেন (সংবদদ্ধম্), তাঁদের মন, চিত্ত ও মন্ত্র যেন একসূত্রে গাঁথা থাকে, একই সংকল্পে যেন তাঁরা উদ্‌বুদ্ধ থাকেন। সে যুগে সমিতি যথেষ্ট সক্রিয় ছিল বলে গোষ্ঠীপতি স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেননি।

ঋগ্‌বেদে সভা বলতে কখনও কখনও সভাকক্ষ বোঝানো হয়েছে। অধ্যাপক কীথ সভাকে সভাকক্ষরূপেই ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু ঋগ্‌বেদের সর্বত্রই সভা বলতে সভাকক্ষ বোঝানো হয়নি, কখনও কখনও প্রতিষ্ঠানও বোঝানো হয়েছে। লুডউইগ-এর মতে সভা ছিল উপজাতি প্রধানদের পরিষৎ। কিন্তু জিমার সাহেব সভাকে গ্রাম-পরিষৎ বলেছেন। মনে হয় সমিতির তুলনায় সভার সদস্যরা সংখ্যায় অনেক কম ছিলেন। গোষ্ঠীর অভিজাত বা মঘবনরাই সভার সদস্য ছিলেন। ঋগ্‌বেদ থেকে জানা যায় যে সভায় পাশা খেলা হত। এর থেকে মনে হয় শুধু রাজনীতিই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল না, সামাজিক অনুষ্ঠান ও খেলাধুলার আয়োজনও সেখানে হত। সমিতির মতো অত সক্রিয় না হলেও রাজার কার্যকলাপের উপর সভা সতর্ক দৃষ্টি রাখত।

ধৃতরাষ্ট্র নামে একজন কাশীনৃপতির কথা আছে। উপনিষদ্ থেকে অজাতশত্রু নামে আর একজন কাশীরাজের কথা জানা যায়। প্রতিবেশী কোসলরাজ্যের সঙ্গে কাশীরাজ্যের প্রায়ই সংঘর্ষ হত। উত্তর বিহারের তিরহুত অঞ্চলে বিদেহ রাজ্যটি গড়ে ওঠে। বিদেহের রাজা ছিলেন জনক। জ্ঞানী বলে তাঁকে উপনিষদে ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে।

রাজকীয় অভিধা : এখানে একটি কথা বলার আছে। উপরে যে রাজ্যগুলির কথা বলা হয়েছে তাদের কোনওটিকেই বৃহৎ আখ্যা দেওয়া যায় না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সম্রাট্, স্বরাট্, বিরাট্, ভোজ ইত্যাদি রাজকীয় অভিধা আছে। বৈদিকোত্তর যুগে বৃহদায়তন রাজ্যের অধিপতিরা এই সকল অভিধা ধারণ করতেন। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগের ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। সে সময় কোনও বৃহদায়তন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই হয়নি। সে ক্ষেত্রে সম্রাট্, স্বরাট্ ইত্যাদি অভিধাগুলিকে রাজারই প্রতিশব্দরূপে গণ্য করতে হবে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি উক্তি থেকেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন মেলে। সেখানে বলা হয়েছে, পূর্ব দেশের রাজাদের 'সম্রাট্' বলা হত, দক্ষিণের রাজারা 'ভোজ' নামে পরিচিত ছিলেন, উত্তরের রাজাদের 'বিরাট্' আখ্যা দেওয়া হত, মধ্যদেশের নৃপতিরা 'রাজা' বলে অভিহিত হতেন।

রাজনৈতিক জীবন : রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজার ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। রাজা এখন আর ভ্রাম্যমান গোষ্ঠীর নিছক এক দলপতি নন, তিনি বিভিন্ন গোষ্ঠী অধ্যুষিত এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিপতি। রাজ্যের সর্বত্র তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা প্রসারিত। তিনি রাজ্যের অন্য দশ জনের মতো নন। শতপথ ব্রাহ্মণে রাজাকে প্রজাপতি ব্রহ্মার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলা হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, দেবত্বের অধিকারী হওয়ায় রাজা একা হয়েও অনেককে শাসন করেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় রাজাকে নিছক প্রজাপতির প্রতিনিধি বলা হয়নি, তাঁকে প্রজাপতির সঙ্গে অভিন্ন বলে কল্পনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে, রাজপদ লাভ করলেই রাজা প্রজাপতি হন না, প্রজাপতি হতে হলে রাজাকে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে হয়।

শক্তিশালী রাজতন্ত্র : বলা বাহুল্য, তখনকার দিনের শক্তিশালী রাজারা নিজেদের পরাক্রম ও বৈভব প্রকাশের জন্য এই দু'টি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন। রাজসূয় এক ধরনের অভিষেক অনুষ্ঠান। তবে এ অনুষ্ঠান সাধারণ রাজ্যাভিষেক নয়, পরাক্রান্ত শক্তিরূপে রাজার আত্মপ্রকাশের এক বর্ণাঢ্য আয়োজন। এই অনুষ্ঠানে পুরোহিত রাজাকে অভিষিক্ত করেন। তারপর রাজা বাঘছালের উপর তাঁর পা দু'খানি স্থাপন করেন। রাজা যে ব্যাঘ্রের মতো বলবান তারই ব্যঞ্জনা এখানে পরিস্ফুট। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজা এক নকল গোহরণে অংশগ্রহণ করেন। তির-ধনুক হাতে তিনি চারদিকে এক পা করে অগ্রসর হন। তাঁর এই এক পা করে চারদিকে পদচারণার অর্থ তাঁর চতুর্দিকে আধিপত্য দাবি করা। রাজার পাশা খেলার মধ্য দিয়ে রাজসূয় যজ্ঞের সমাপ্তি ঘটত।

অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকালে যজ্ঞের ঘোড়া এক বছর স্বেচ্ছায় বিচরণ করত। তাকে অনুসরণ করতেন একদল বাছাই করা সৈন্য। ঘোড়া কোথাও বাধা পেলে যুদ্ধ হত। আর বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করে বৎসরান্তে ঘোড়া নিরাপদে যজ্ঞস্থানে ফিরে এলে তাকে বলিদান করা হত। যে অঞ্চলগুলি পাড়ি দিয়ে ঘোড়া ফিরে আসত সে অঞ্চলগুলি যজমান রাজার অধিকৃত বলে গণ্য হত। সন্দেহ নেই, অশ্বমেধের মতো যজ্ঞের অনুষ্ঠান সে কালের আন্তঃরাষ্ট্রিক সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তুলেছিল।

বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র : রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির অর্থ রাজপদের উপর বংশানুক্রমিক কর্তৃত্বের

প্রতিষ্ঠা। দশ পুরুষ ধরে এক পরিবারের লোকেরা রাজত্ব করেছেন (দশপুরুষম্ রাজ্যম্) শতপথ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এরূপ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ আছে। রাজার মৃত্যুর পর সাধারণত তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনে আরোহণ করতেন। তবে রাজা অত্যাচারী বা অকর্মণ্য হলে প্রজারা অনেক সময় তাঁকে পদচ্যুত করতেন। অথর্ববেদে ও ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে এরূপ অনেক ঘটনার নজির আছে। সৃঞ্জয়রা তাঁদের রাজা দুষ্টরীতু পৌংসায়নকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। দুষ্টরীতু পৌংসায়ন ও তাঁর পূর্বপুরুষরা দশ পুরুষ ধরে রাজত্ব করেছিলেন। তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে এক রাজদ্রোহী পুরোহিতের কথা আছে। তিনি এক অত্যাচারী রাজার শাসনের অবসান ঘটাতে রাজ্যের বৈশ্যদের প্ররোচিত করেন। কোনও রাজাকে পদচ্যুত করা হলে সাধারণত তাঁরই পরিবারের অন্য কাউকে সিংহাসনে বসানো হত।

রাজশক্তির সীমাবদ্ধতা : রাজার ক্ষমতা বাড়ছিল ঠিকই তবু তা নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠেনি। কোনও কাজে হাত দেওয়ার পূর্বে তাঁকে প্রজাদের প্রতিক্রিয়ার কথা ভাবতে হত। প্রজাদের অসন্তোষ রাজার পক্ষে কত মারাত্মক হতে পারে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তার অজস্র নিদর্শন আছে। দ্বিতীয়ত, ধর্মের অনুশাসন মেনেই রাজা রাজ্য শাসন করতেন। ধর্ম সকলের উপরে। সমাজ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সবকিছু ধর্মই ধারণ করে আছে। এই বিধান অলঙ্ঘনীয়। রাজা নিজে ধর্মের বিধান দিতে পারতেন না, ধর্মের ব্যাখ্যা করার অধিকারও তাঁর ছিল না। তিনি তাঁর রাজ্যের মধ্যে ধর্মের অনুশাসন কার্যকর করতেন। তৃতীয়ত, ঠিক আগের মতো তত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও এ যুগেও সভা ও সমিতির একটা প্রভাব তো ছিলই। সভা ও সমিতির এই প্রভাবের আভাস আছে অথর্ববেদ ও শতপথ ব্রাহ্মণে। এই দুই প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা যেন তাঁকে সর্বপ্রকার সাহায্য করেন, জনৈক রাজার এই আশার কথাও সে ব্রাহ্মণে ব্যক্ত হয়েছে। অথর্ববেদে রাজাকে সভা ও সমিতির সঙ্গে সংঘর্ষের পথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এতেও তখনকার দিনে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই দুই সংস্থার গুরুত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। চতুর্থত, সকলে না হলেও সে যুগের কোনও কোনও রাজা মনে করতেন, স্বাধিকার নয়, অছি বা ন্যাসরক্ষকরূপেই তাঁরা রাজত্ব ভোগ করতেন। তাঁরা সিংহাসনে বসেছেন নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, প্রজাদের নৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য, প্রজাদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য।

সে যুগের রাজাদের বেশির ভাগ সময় যুদ্ধ-বিগ্রহে কাটলেও তাঁদের অনেকেই জ্ঞানে, গুণে ও বিদ্যাবত্তায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। অনেক বিদ্বান ও গুণবান ব্রাহ্মণ তাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তেজস্বিতার সঙ্গে জ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল তাঁদের চরিত্রে। ব্রাহ্মণে, উপনিষদে এরূপ কয়েকজন রাজর্ষির উল্লেখ আছে।

আমলাতন্ত্র : শাসনাদি কাজে রাজার সহযোগী রূপে এক শক্তিশালী আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হয়। রাজার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল ছিলেন বলে আমলারা 'রত্ন' বলে গণ্য হতেন। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয় সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপ ১০ জন রত্নের উল্লেখ আছে। এঁরা হলেন পুরোহিত, সূত, মহিষী পরিবৃক্তী, বাবাতা, সংগ্রহীতৃ, অক্ষাবাপ, সেনানী, গ্রামণী ও ভাগদুঘ। এঁদের মধ্যে মহিষী, পরিবৃক্তী ও বাবাতা হলেন রাজার তিন পত্নী। রাজ্যশাসনে এই তিন রানি কী ভূমিকা পালন করতেন তা জানা যায় না। সেনানী, গ্রামণী ও পুরোহিত ঋগ্‌বেদের যুগেও ছিলেন। যে গ্রামণীকে রাজার রত্ন বলে গণ্য করা হত তিনি পদমর্যাদায় অন্য গ্রামণীদের উপরে ছিলেন। সংগ্রহীতৃকে অনেকে কোষাধ্যক্ষ বলে মনে করেন। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। তখনকার দিনে মুদ্রার প্রচলন ছিল না। সুতরাং রাজার কোষাগারও ছিল না। সংগ্রহীতৃকে রাজার ভাণ্ডাগারিক

বলেই ভাবা উচিত। অক্ষ বা পাশা ক্রীড়া বিভাগের অধ্যক্ষ অক্ষাবাপ। রাজার রথচালক ও রণসঙ্গী যিনি তিনিই সূত। রাজস্ব যিনি সংগ্রহ করেন তিনিই ভাগদুঘ। শতপথ ব্রাহ্মণে ক্ষত্তৃ (রাজ পরিবারের সরকার), গোবিকর্তন (রাজার শিকারের সঙ্গী) ও পালাগল (দূত) নামে আরও তিন রত্নের উল্লেখ আছে। মৈত্রায়ণী সংহিতা থেকে তক্ষণ বা ছুতার এবং রথকার নামে আরও দুই রত্নের কথা জানা যায়।

রত্ন নন অথচ গুরুত্বপূর্ণ, এরূপ এক কর্মচারী স্থপতি। তিনি সম্ভবত প্রধান বিচারপতি ছিলেন। আবার তিনি সীমান্ত অঞ্চলের অধিকর্তাও হতে পারেন। এই সকল কর্মচারীদের রাজাই নিয়োগ করতেন। তবু রাজার উপর এঁদেরও একটা প্রভাব ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে সূত ও গ্রামণীকে 'রাজকৃৎ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যিনি রাজপদে নিযুক্ত করেন তিনিই রাজকৃৎ।

বিচার ব্যবস্থা : বিচার ব্যবস্থায়ও রাজার বিশেষ ভূমিকা ছিল। তবে সব বিচারের ভার নিজের হাতে না রেখে কিছু কিছু বিচারের দায়িত্ব তিনি অধ্যক্ষদের উপর ছেড়ে দিতেন। 'গ্রাম্যবাদী' নামে এক শ্রেণির বিচারকদের উপর গ্রামের ছোট ছোট মামলার বিচারের ভার ছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর সততা প্রমাণের জন্য হাতে আগুন বা গরম লোহা রেখে কঠোর পরীক্ষা দিতে হত। লোকদের বিশ্বাস ছিল, দোষী হলেই হাত পুড়বে, অন্যথায় নয়। চুরি, ডাকাতি, ব্যভিচার, নরহত্যা, মদ্যপানের মতো অপরাধমূলক ঘটনাগুলি তখনকার দিনে সচরাচর ঘটত। অপরাধীকে বেশ কঠিন শাস্তিই দেওয়া হত। কোনও চোর হাতে-নাতে ধরা পড়লে হয় তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত, নয় তার হাত দু'খানি কেটে ফেলা হত। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অপহৃত দ্রব্য ফেরত দিলেই চোরকে ছেড়ে দেওয়া হত।

রাজস্ব : এ সময় থেকে নিয়মিত কর আদায়ের ব্যবস্থা চালু হয়। প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যয় নির্বাহের জন্য নিয়মিত কর প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। এই নিয়মিত করকে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে 'বলি' বলা হয়েছে। 'বলি' ঋগ্বেদেও ছিল। কিন্তু তখন বলি দেওয়া বা না-দেওয়া দাতার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করত। যা ছিল ঐচ্ছিক তা এখন হল আবশ্যিক। প্রজাদের সকলেই যে রাজাকে 'বলি' দিতেন তা নয়। যাজন ও অধ্যাপনা ছিল ব্রাহ্মণদের জীবিকা। ক্ষত্রিয়রা ছিলেন যুদ্ধোপজীবী। ধনোৎপাদনের সঙ্গে এঁরা কেউ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না। 'কর' প্রদানের দায়িত্ব থেকে এঁদের সম্ভবত রেহাই দেওয়া হয়েছিল। কৃষি-শিল্পোপজীবী ও বণিক সম্প্রদায়ের লোকেরাই প্রধানত করভার বহন করতেন। অথর্ববেদে প্রদেয় বলির পরিমাণ এক-ষোড়শ অংশে ধার্য করা হয়েছে। অর্থাৎ উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে মোট উৎপাদনের এক-ষোড়শ অংশ ও বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষেত্রে মুনাফার এক-ষোড়শ অংশ রাজভাণ্ডারে জমা দিতে হত। বলি দিতে হত জিনিসে, মুদ্রায় বা টাকায় নয়। টাকার ব্যবহার তখনও চালু হয়নি।

সমাজ-জীবন : ঋগ্বেদের যুগে যেমন এ যুগেও তেমনি সমাজের ভিত্তি ছিল পরিবার বা কুল। পরিবার ছিল একান্নবর্তী। পিতা বা তাঁর অবর্তমানে জ্যেষ্ঠ পুত্র পরিবারের অভিভাবক হতেন। পরিজনদের উপর অভিভাবকের অপ্রতিহত কর্তৃত্ব ছিল। পিতা পুত্রকে বিক্রি করছেন, ঐতরেয় ব্রাহ্মণে এ রকম ঘটনারও বর্ণনা আছে। তবে অভিভাবকের সঙ্গে পরিবারের সকলের সম্পর্ক ছিল স্নেহ ও প্রীতির। এক এক পরিবারে সাধারণত তিন পুরুষের পরিজনেরা বাস করতেন। দত্তক গ্রহণের রীতি ছিল। অনেক সময় সন্তান থাকলেও পিতা দত্তক গ্রহণ করতেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ভ্রাতৃকলহের উল্লেখ বিরল নয়। বড়দের পূর্বে ছোটদের বিবাহ নিন্দনীয় ছিল। পুত্র-